ঈশ্বর গুপ্ত (যুগসন্ধির কবি) ১৮১২ – '৫৯

(কবি ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা কাব্যে ভিন্ন পথের পথিক হয়ে ভিন্ন স্বাদের সূচনা করে গেছেন,) তবে, তাঁর মধ্যে পিছুটানও কম ছিলনা। তিনি যেমন সদাসর্বদা সতর্ক ভাবে সম্মুখে ও পশ্চাতের

সাংবাদিকতা: ঈশ্বরগুপ্তের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে স্বরচিত কাব্য ছাড়াও রয়েছে সাময়িক পত্র সম্পাদনা ও নব্য সাহিত্যিকদের উৎসাহ দান এবং পূর্ববর্তী সাহিত্যিক জীবনী বা রচনার উদ্ধার সাধন। তিনি ১৮৩১ খ্রীঃ সাপ্তাহিক পত্ররূপে যে 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদনা আরম্ভ করেন, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সেটিই বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম দৈনিক পত্রের মর্যাদালাভ করে। এছাড়া, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরগুপ্ত

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যবৈশিষ্ট্য :

① ছড়া-রচয়িতা : ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম জীবনে যে কবিগান রচনা করে 'কবিওয়ালা' হয়েছিলেন, পরবর্তীকালের রুচিশীল পাঠকরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে কবিওয়ালার ঊর্ধ্বে স্থান দিতে রাজি হননি। তাই তিনি কখনো প্রকৃত কবির (poet) স্বীকৃতি পাননি, তাঁকে বলা হয় 'ছড়া-রচয়িতা' (verse-maker)

তাঁর কালেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সোনালি সূর্য উদিত হয়েছিল,

② প্রাচীনত্ব ও নবীনত্বের লক্ষণ : (যুগসন্ধির লক্ষণ) :

'যুগসন্ধি' কথাটির অর্থ, প্রাচীন এবং নতুন যুগের ভাবধারা ও বিশ্বাসের একসাথে প্রকাশের মহামুহূর্ত, এই অবস্থায় বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ সমাপ্ত হয়েছে, কিন্তু তার শেষটুকু তখনও সমাজে আছে, আধুনিক যুগ আরম্ভ হয়নি, শুধু তার আভাসমাত্র পাওয়া যাচ্ছে, — এই অস্পষ্ট আলো-আঁধারী সময়কে 'যুগসন্ধিকাল' বলা হয়েছে, এই সময়কালে জন্ম হলো লেখকের বা কবির বা ব্যক্তির ভাবনা এবং আচরণের মধ্যে পরস্পরবিরোধী চিন্তাভাবনা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, ঈশ্বরগুপ্তের ক্ষেত্রেও ঠিক ~~তাই-ই~~ ঘটেছিল, [তা অন্যথা হয়নি]

যুগসন্ধিক্ষণের এই সংযোগ-বিয়োগের ফলে ঈশ্বর গুপ্তের রচনার মধ্যেও পরস্পরবিরোধী দ্বিভাবের লক্ষণসমূহ ফুটে উঠেছে।

③ **কাব্যের নতুন ভাবধারা** : ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীনপন্থী হলেও এবং মনোভাবের দিক থেকে কবিকঙ্কণ-রায়গুণাকরের উত্তরাধিকারী হলেও তিনি আখ্যানকাব্য রচনার দিকে যাননি, তিনি বাংলা কাব্যে এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, তাঁর দৃষ্টি ছিল বাস্তব জগতের দিকে নিবদ্ধ — তাই সমসাময়িক বস্তু-জগতের নানাবিধ খুঁটি এবং নাটিনাটিই তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ালো, আকারের দিক থেকেও তাঁর কবিতা প্রাচীন রীতি ত্যাগ করে নবীন কালের ধারণ করলো, ঈশ্বরচন্দ্র বিভিন্ন সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলে তাদের ক্ষুধা ভরানোর জন্য তাঁকে প্রচুর কবিতা রচনা করতে হতো এবং স্বভাবতঃই তার আকার হতো ক্ষুদ্র, প্রাচীনযুগের 'চর্যাপদ' মধ্যযুগের 'বৈষ্ণবকবিতা' এবং যুগসন্ধিক্ষণের 'শাক্তপদ' গুলিও খণ্ড কবিতা, কিন্তু গানের উদ্দেশ্যেই রচিত, কোনো কোনো কবিতা গীতিকবিতারও ধর্ম-বিশিষ্ট, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত যে 'খণ্ড কবিতা' রচনা করলেন, তা শুধুই পাঠনীয় বা পাঠ্য, এগুলি গীতিকবিতাও নয় কিংবা গানেরও যোগ্য নয়, বস্তুতঃ পরবর্তীকালের বাংলা কবিতা মূলতঃ এই ধারাটিই অনুসরণ করেন, সমকালের বিষয় বা ঘটনাকে অবলম্বন করে ক্ষুদ্র মাপের খণ্ড কবিতা রচনার মধ্য দিয়েই ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যজীবন গড়ে ওঠে।

④ বিষয়-বৈচিত্র্য : পারিবারিক জীবনে কবি যে অশান্তি ভোগ করেছিলেন এবং সমাজে যে অত্যাচার উৎপীড়নের নিদর্শন তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তারই ফলে তিনি সমাজের উপর আক্রোশী হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতার মধ্যেই এই বিক্ষোভ মনোবৃত্তি, নীতিবাদী মনোভাব ফুটে উঠেছে, বিষয়-নির্বাচনে তিনি বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, — কিন্তু সব কিছুকেই নিরীক্ষণ করেছেন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে, তিনি 'আনারস, তপসে মাছ, পৌষপার্বণ' কে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কিন্তু সবতেই ব্যঙ্গের লবণ ছিটিয়ে দেওয়া, ঈশ্বর গুপ্তই সর্বপ্রথম কবিতাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মমোহমুক্ত করলেন, ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় তাই 'নৈতিক ও পারমার্থিক' বিষয়ের পাশে দেখা দিয়েছে — 'সামাজিক ও ব্যঙ্গাত্মক', 'ঋতুবর্ণন' বিষয়ক, 'যুদ্ধ বিষয়ক', 'বিবিধ বিষয়ক' কবিতাবলির সম্ভার।

⑤ সমাজ-চেতনা ও ব্যঙ্গ-রঙ্গ (স্যাটায়ার) : সমাজ-চেতনা পুরাতন কবিতায় প্রত্যক্ষত স্থান পায়নি, সমাজ-চেতনা মধ্যযুগের ব্যক্তিত্বের সচেতন অংশ হয়ে উঠতে পারেনি, কবি ঈশ্বর গুপ্ত ছিলেন সাংবাদিক, সাংবাদিক হিসাবে সমকালীন সমাজ-জীবন সম্পর্কে যে তীক্ষ্ণ সচেতনতা তিনি বহন করতেন, তা তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে। অতিরক্ষণশীলতার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু সমকালীন ইয়ং-বেঙ্গলদের উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছিলেন —

"যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে,
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে ?"

আধুনিক স্ত্রী সম্পর্কে বলেন — "বিবিজান চলে যান লবেজান করে," ইংরেজ মহিলা সম্পর্কে কটূক্তি করেন —

"বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছুটে,
আহা তায় রোজ রোজ কত রোজ ফুটে ॥"

হাস্যরসাত্মক বিদ্বেষমূলক রচনাকে বলে স্যাটায়ার, আর ঈশ্বরগুপ্ত ব্যঙ্গরসাত্মক সৃষ্টিতে এক স্যাটায়ারিস্ট হিসেবে চিহ্নিত/

স্ত্রীশিক্ষার বাড়াবাড়ি দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন — এবং ব্যঙ্গাত্মক ভাবে বলেছেন —

" আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো, ব্রতধর্ম কর্তো সবে,
একা বেথুন এসে শেষ করেছে, আর কি তাদের তেমন পা[বে]
যত ছুঁড়িগুলো তুড়ি মেরে কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে,
তখন এ-বি শিখে বিবি সেজে বিলাতী বোল কবেই কবে"

(*)(*)

⑥ <u>দেশাত্মবোধ</u> : ঈশ্বরগুপ্তের সমাজচেতনারই বিশিষ্ট প্রকাশ দেশাত্মবোধ, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়ই প্রথম জাতীয় জীবন ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর স্বদেশচেতনা সংকীর্ণ আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ নয়।

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া, . . .
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥"

তাঁর স্বদেশপ্রেম আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করে [illegible]

(*)(*) "রেতে মশা, দিনে মাছি,
এই নিয়ে কলকাতায় আছি,"
— অভিজ্ঞতা-তিক্ত, সরস অথচ তির্যক এই ব্যঙ্গকবিতাটিও ঈশ্বরগুপ্তের রচনা.

⑦ <u>ভাষা ও ছন্দে অধিকার</u> : ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাগুলি থেকে কবির ভাষা, ছন্দ-আদির উপর অসাধারণ অধিকার-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে [illegible] (সংস্কৃত ও ইংরাজি) [illegible]

"ধরে ছুঁড়ি ঠনঠনিনি, মকামাকি চনচনিনি,
আঁতে আরীর ঝনঝনিনি
একটু আগুন লাইটো সিরি,"

[illegible]

এছাড়াও বলা যায় যে, ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে রাজনৈতিক চেতনাও প্রকাশিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষ, নীলকর, শিখযুদ্ধ, ব্রহ্মযুদ্ধ ইত্যাদি বিষয়ও তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে।

কৌলীন্য প্রথাকে কবি সমর্থন করেননি, তাই 'কৌলিন্য' কবিতায় হিন্দু সমাজের বহুবিবাহ কুলপ্রথার বিরুদ্ধে কবির শাণিত উক্তি — "মিছে কেন কুল নিয়ে কর আঁটা-আঁটি,
এ যে কুল কুল নয় সারমাত্র আঁটি,"

মিশনারীদের অত্যাচার, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ ও ইংরাজী সভ্যতা সম্পর্কে কবির বিরূপ মনোভাবও ফুটে উঠেছে তাঁর কবিতায়

যুক্তির বাহন হিসাবে গদ্য নিয়ে এল পাশ্চাত্যজ্ঞান-বিজ্ঞানের হাওয়া, অপরদিকে পদ্য ছিল ভারতীয় প্রাচীন ধর্মের বেদি। ঈশ্বর গুপ্ত তখনও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের নতুন হাওয়াকে বুক পেতে গ্রহণ করতে শেখেননি, তবে তিনি এটুকু অনুভব করতে শিখেছিলেন যে, পুরানো দিনের বিষয় নিয়ে কবিতা লিখে নবীন যুগের মানুষের মন ভোলানো যাবে না, তাই তিনি প্রত্যক্ষ জনজীবনের সহজলভ্য বিষয়কে কবিতার বিষয় করলেন, নবীন বাংলা সাহিত্যের উদ্বোধনের যুগে গুপ্তকবি ঈশ্বরগুপ্ত ছিলেন সত্যসন্ধী, বাংলা সৃজনীসাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সেকালের একাধারে অতীতসন্ধিৎসু ও অনাগত দিশারী, তবে, সূর্যোদয়ের পর আকাশচ্যুত সন্ধ্যাতারাকে কে বা যত্ন করে তুলে রাখে? ঈশ্বরগুপ্তের ও সেই পরিণামই হয়েছিল — তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে পাঠকসমাজ তাঁকে ভুলতে বসেছিল। কারণ, রঙ্গকৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও হাস্যরস সাহিত্যকে দীর্ঘজীবন দিতে পারে না, ঈশ্বর গুপ্ত নতুনের সূচনা করেছিলেন, কিন্তু তার পুরো ধারাপাট ধরতে পারেননি। আর একটু দীর্ঘজীবী হলে হয়তো তিনি মধুসূদনের কাব্যের মত বঙ্গ-সাহিত্যে একটা বৈপ্লবিক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারতেন।

(ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য —
"যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি, তিনি এই বাঙালার সমাজের কবি, তিনি বাঙালার গ্রাম্যদেশের কবি, ... ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist,")